

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্লাস

আজ - কাল - পরশু

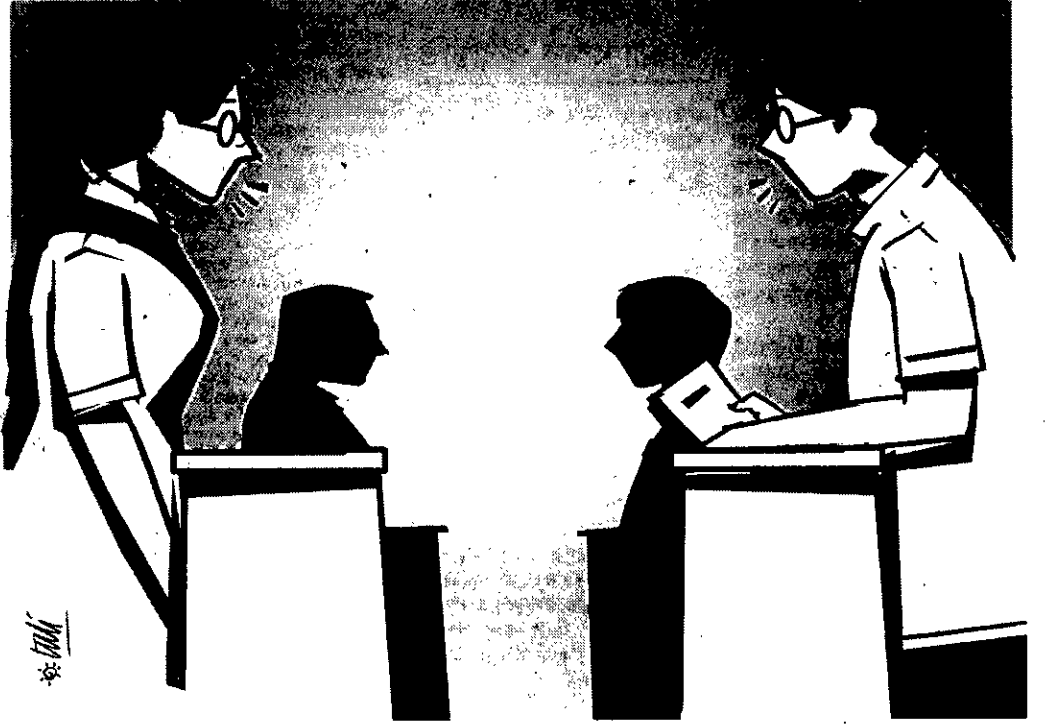
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক তৎপরতা বাড়ানোর দাবি উঠেছে। দাবিটা যৌক্তিক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রস্তাব আসছে। সব প্রস্তাব একসঙ্গে পর্যালোচনা করে এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। এই পটভূমিতে আমাদের কিছু চিন্তা যোগ করতে চাই। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। ১. প্রাথমিক পর্যায়ে, ২. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ৩. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। একইভাবে মাদ্রাসাও এই ভাগে পড়বে। ভাগ করতে হবে এ জন্য যে বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য একই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঠিক হবে না। বয়সের কথা ভেবে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে একটা রুটিন আছে। অনেক স্কুলে দুই শিফটও আছে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের বিকেল পাঁচটার পর রেখে দেওয়া অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মানতে চাইবেন না। শিক্ষার্থীরা আবার নানা রকম কোটিংয়ে পড়ে। কাজেই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ক্লাস রুটিনের ভেতরেই রাখতে হবে। ক্লাস রুটিনে প্রতি সপ্তাহে একটা লাইব্রেরি পিরিয়ড (বই ধার নেওয়া, ফেরত দেওয়া এবং বই নিয়ে আলোচনা) ও সাংস্কৃতিক পিরিয়ড রাখা যায়। এ দুই পিরিয়ড থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় কীভাবে নম্বর যুক্ত করা যায়, তার একটা পথ বের করতে হবে। নইলে অনেক শিক্ষার্থী মনোযোগ দেবে না। সাংস্কৃতিক পিরিয়ডের জন্য একটা সিলেবাস তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে থাকতে পারে গানের গ্রন্থ, নাচের গ্রন্থ, আবৃত্তির গ্রন্থ, চিত্রকলা গ্রন্থ ইত্যাদি। মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ও অবিভক্ত বঙ্গের অন্তত ২০ জন মনীষীর জীবনকথা আলোচনা করা যায় তাঁদের জন্মবার্ষিকীতে। এদের মধ্যে থাকবেন রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সংগীত-যন্ত্রশিল্পী, সমাজকর্মী, নারী নেত্রী, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, উদ্ভাবক প্রমুখ। স্কুলের শিক্ষার্থীরা যেন দেশের (ও অবিভক্ত বাংলার) শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনকথা জানতে পারে।

গান, নাচ, আবৃত্তি, চিত্রকলা ইত্যাদি গ্রন্থের ক্লাসের জন্য পূর্ণ সময় শিক্ষক রাখা সম্ভব না হলে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়েও ক্লাস নেওয়া যায়। তবে পূর্ণকালীন শিক্ষক রাখতে পারলেই ভালো হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গান, নাচ, আবৃত্তি, চিত্রকলা ক্লাসের জন্য সৃষ্টিভিত্তিকভাবে একটা সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা কী কী বই লাইব্রেরি থেকে ধার নিয়ে পড়বে তারও একটা তালিকা থাকতে হবে। হাজার হাজার বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ২৫-৫০টি বই সৃষ্টিভিত্তিকভাবে নির্বাচন করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা এই তালিকা থেকেই পড়বে। তালিকায় উল্লিখিত বইয়ের প্রতিটি স্কুল লাইব্রেরিতে থাকতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই তালিকার বাইরেও বই পড়তে পারে। সেটা শিক্ষার্থীর আগ্রহের ব্যাপার। তবে স্কুলজীবন শেষ করার আগে তাদের এই ৭৫টি বই অবশ্যই পড়তে হবে এবং নির্বাচিত কিছু বই নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। পরীক্ষায় কোনো বই সম্পর্কে আলোচনা বা পাঠের প্রতিক্রিয়াও লিখতে হবে।

গান, নাচ, আবৃত্তির জন্যও সৃষ্টিভিত্তিকভাবে সিলেবাস রচনা করতে হবে। শিক্ষকদের খুশিমনতো কিছু শেখানোর স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হবে না। স্কুলে (দুই পর্যায়ে) এসব ক্লাস করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলা। পরবর্তী জীবনে সে যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেন, তার মধ্যে সংস্কৃতির সুসুন্দর বস্তুগুলো যেন সর্বদা সক্রিয় থাকে। এদের মধ্যে অনেক আগ্রহী শিক্ষার্থী স্কুল বা কলেজজীবন শেষ করেই বা শেষ করার আগেই নিজ নিজ এলাকার গান, নাচ, আবৃত্তি বা চিত্রাঙ্কন স্কুলে ভর্তিও হয়ে যেতে পারে। প্রশিক্ষণ, রেওয়াজ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে কারও কারও বড় শিল্পী হয়ে ওঠাও বিচিত্র কিছু নয়। তবে বড় শিল্পী না হলেও তাদের অনেকের মধ্যে গান, নাচ, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি এবং পাঠ্যসূচির বাইরের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সারা জীবনের জন্য গেঁথে যাবে।



উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় একই রকম সামান্য রদবদল করে একটা সিলেবাস তৈরি করতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক রুটিনে আরও দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ভালো হয়। ১. বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ২. উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ক্লাসের আয়োজন করতে পারলে ভালো হয়। আমাদের অনেক শিক্ষার্থীর কমিউনিকেশন দক্ষতা খুব দুর্বল। সে যা ভাবছে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অনেকের এই দুর্বলতা সারা জীবনই থেকে যায়। স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে কেউ এই রোগ সারানোর চিকিৎসা করে না। বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতার ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কমিউনিকেশন দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব।

প্রতিবছর শুরুর দিকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা উচিত। এটা হওয়া উচিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে। যারা বিভিন্ন বিষয়ে (গান, নাচ, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিনয়, আবৃত্তি, রচনা লেখা) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করবে, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি সপ্তাহের এমন একটা আবহ তৈরি করতে হবে, যাতে বছরজুড়ে ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্থানীয় খ্যাতনামা প্রবীণ শিল্পী ও তারকাদের এসব অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ করা হলে ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত হবে। সংস্কৃতি সপ্তাহে অবশ্যই বিজ্ঞান মেলাও আয়োজন করতে হবে, যাতে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পায়।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস কীভাবে উদ্‌যাপিত হবে তারও একটা কাঠামো শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করতে পারে। অন্তত তিনটি জাতীয় দিবসে (শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস) সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। নিয়মিত ক্লাসের বিষয় না ঘটিয়ে শেষের একটি বা দুটি পিরিয়ড বাদ দিয়ে সপ্তাহব্যাপী সম্মিলিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। এসব অনুষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করে বক্তৃতা, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, স্মৃতিচারণা, আবৃত্তি, গান, নৃত্য, নাটকসহযোগে বিচিত্রানুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত বইয়ের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী ইত্যাদি। এভাবে সাত দিন শিক্ষার্থীরা ওই দিবসের নানা কিছুর মধ্যে থাকতে পারলে মূল জাতীয় দিবসে তারা অন্য রকম এক অনুভূতি নিয়ে মুক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি জাতীয় দিবসে সরকারি ছুটি থাকে। ছুটির দিনে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতে বলা ঠিক হবে না।

সেদিন তারা অন্য সবার সঙ্গে গণ-অনুষ্ঠানে যাতে অংশ নেয়, সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত।

আমাদের স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষাও অন্যতম একটি বিষয়। সেই ধর্মশিক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিক পর্যালোচনার কথাও বিবেচনা করা উচিত। ধর্মশিক্ষা নিয়ে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির সুযোগ যাতে তৈরি না হয়, সেটা বিবেচনায় নিয়েই এই পর্যালোচনা হতে হবে।

অনেকে বলতে পারেন, স্কুলের পিরিয়ড তো সীমিত। এত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তারা কীভাবে করবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্কুলে ক্লাসের সময় তো আর বাড়ানো যাবে না। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে কম প্রয়োজনীয় বিষয় কী কী আছে। উচ্চপর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করে কম প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিতে হবে। অথবা দুটি কাছাকাছি বিষয়কে একীভূত করে এক বিষয় করতে হবে। একজন শিক্ষার্থীর মানস গঠনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম স্কুল-কলেজের মতো হবে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-কারিকুলাম হিসেবে বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে। এসব ক্লাবকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্লাবের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। সব ক্লাবের কর্মসূচির ভিত্তিতে বছরের শুরুতে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন করতে হবে।

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও আবাসিক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচন বাধ্যতামূলক করতে হবে। নির্বাচন ছাড়া শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব হয় না। নির্বাচন পরিচালনা, অংশগ্রহণও একধরনের শিক্ষা। নির্বাচনে জয়-পরাজয় মেনে নেওয়াও একটা শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী নিজেরা নির্বাচন করে ক্ষমতায় এসেছেন, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করছেন না। আমাদের ধারণা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেকটা সুস্থ হবে। সন্ত্রাসী ও টেন্ডারবাজ তথাকথিত ছাত্রনেতাদের দৌরাণ্ডা আর থাকবে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্বাচিতরাই ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

তরুণ সমাজকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত করতে হলে বহুমুখী কর্মসূচি নিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তার একটি। এই কার্যক্রম যাতে অর্থবহ হয় আমাদের সবাইকে সেই চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

● মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর: মিডিয়া ও উন্নয়নকর্মী।